Vol. 49 | No. 1 | 2011

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

বাংলা সাহিত্যে পাটচাষ ও পাটের ব্যবহার

Volume	49
Issue	1
Year	2011
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	এস. এম. রেজাউল করিম
Published online	October 1, 2011
DOI	10.62328/sp.v49i1.5
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v49i1.5
Pages	৯৩-১০৩
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

বাংলা সাহিত্যে পাটচাষ ও পাটের ব্যবহার

Check for updates

এস. এম. রেজাউল করিম*

মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থা জানার অন্যতম উৎস হলো সাহিত্যিক উপাদান। এ কারণে প্রাচীন আমল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত মানুষের, বিশেষ করে বাংলার কৃষকশ্রেণির আর্থ-সামাজিক ইতিহাস পুনর্গঠনে বাংলা সাহিত্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বাংলায় পাটচাষের ইতিহাস সুপ্রাচীন। প্রাচীন আমল থেকে বাংলায় পাটচাষ শুরু হয় এবং বাংলার সাধারণ মানুষ বিশেষত কৃষকশ্রেণির আর্থ-সামাজিক জীবনে পাটচাষ একটি বিশিষ্ট স্থান দখল করে। বাংলার কৃষকশ্রেণির আর্থ-সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে একটা সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায় সমসাময়িক কালে (প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক যুগ) রচিত পাট-সম্পর্কিত বিভিন্ন বাংলা কবিতা-পঙ্‌ক্তিমালা থেকে। আলোচ্য প্রবন্ধের প্রধান উদ্দেশ্য হলো, প্রাচীন আমল থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত রচিত বাংলা সাহিত্যে পাটচাষ ও পাটের ব্যবহার সম্পর্কে পর্যালোচনা করা।

সুপ্রাচীন কাল থেকে বাংলায় পাটচাষ হলেও সর্বপ্রথম পৃথিবীর কোথায় কীভাবে পাটের উৎপত্তি ও পাটচাষের প্রচলন শুরু হয় এবং ভারতবর্ষ তথা বাংলায় প্রথম কীভাবে পাটের আগমন ঘটে তা সঠিকভাবে জানা যায় না। তবে পাটচাষের ইতিহাস যে অতি প্রাচীন তা নিয়ে কোনো বিতর্ক নেই। উপরন্তু পাটের উৎপত্তি ও পাটচাষের প্রচলন পৃথিবীর যে অঞ্চলেই শুরু হোক না কেন, প্রাচীনকাল থেকেই যে বাংলায় পাটচাষ হতো তাতেও কোনো সন্দেহ নেই। ১৯৬১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে *Marketing of Jute in East Pakistan* শীর্ষক গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্যে একটি গবেষণা পরিষদ গঠন করা হয়। এ পরিষদ উক্ত গ্রন্থে বাংলায় পাটচাষের সূচনাকাল সম্পর্কে মন্তব্য করে যে, অতি প্রাচীনকাল থেকেই বাংলায় পাট চাষ করা হয়।[১] ১৮৭৩ সালে Bengal Jute Enquiry Committee গঠন করে পাটচাষ, পাটের উৎপাদন ইত্যাদি বিষয়ে সরকার তথ্য সংগ্রহের উদ্যোগ গ্রহণ করে। সরকারের এ উদ্যোগ সফল করার লক্ষ্যে জেলা কমিশনারদের পাট বিষয়ে তথ্য প্রদানের জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়। সরকারের এ নির্দেশে সাড়া দিয়ে সিরাজগঞ্জ জেলার কমিশনার E. McDonell বাংলায় পাটচাষ সম্পর্কে এক দীর্ঘ রিপোর্ট দেন এবং এ রিপোর্টের শুরুতে বাংলায় পাটচাষের সূচনাকাল সম্পর্কে মন্তব্য করেন যে, "It would be difficult to say when *Koshtah* was first grown in this country, but we have every reason to believe that it has been used to a great extent for many centuries."[২] ১৮৭৩ সালে হুগলি জেলার কালেক্টর বাংলায় পাটচাষের সূচনাকাল সম্পর্কে বলেন, স্মরণাতীতকাল থেকেই বাংলায় পাট উৎপন্ন হয়। অবশ্য এ উৎপন্নের পরিমাণ ছিল সীমিত এবং তা প্রধানত গৃহকর্মের প্রয়োজনে ব্যবহৃত হত।[৩]

*সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, প্রাচীনকাল থেকেই ভারতবর্ষ তথা বাংলায় পাটের চাষ হতো। তবে এ চাষ ছিল সীমিত পরিসরে এবং তা সাধারণভাবে গৃহকর্মের প্রয়োজনে ব্যবহৃত হতো। এছাড়াও দরিদ্র লোকেরা নিজ গৃহে বসে পাটের মোটা কাপড় প্রস্তুত করে তা পরিধান করত।

প্রসঙ্গত বলা যায় যে, উনিশ শতকের শুরুতে পাট (Jute) শব্দ তার বর্তমান অর্থে ব্যবহৃত হতে শুরু করেছে। কিন্তু প্রাচীন ও মধ্যযুগের বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থে আমরা যে পট্টবস্ত্র বা পাট বা পাটোল শব্দ পাই তা দ্বারা শুধু বর্তমানের পাট (Jute) বুঝায় না। প্রাচীন ও মধ্যযুগের বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থে আমরা যে পট্টবস্ত্র বা পাট বা পাটোল শব্দ পাই তা দ্বারা ভিন্ন অর্থও বুঝানো হয়। যেমন — প্রাচীনকালে রচিত *মহাভারত* ও *মনুসংহিতায়* পট্টবস্ত্র ব্যবহারের কথা উল্লেখ আছে।[৪] এখানে পট্টবস্ত্র শব্দের অর্থ হলো 'রেশমি কাপড়' (সংস্কৃত পট্টবস্ত্র অর্থ কৌষেয় বস্ত্র বা রেশমি কাপড়)। এভাবে প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন গ্রন্থে পট্টবস্ত্র বা পাটোল শব্দের ব্যাপক প্রচলন দেখা যায়। এ থেকে অনুমান করা যায় যে, প্রাচীন ও মধ্যযুগে এসব শব্দ জনপ্রিয় ছিল।

অর্থাৎ প্রাচীনকাল থেকে এদেশীয় লোকদের নিকট যদিও পাট পরিচিত ছিল, তারপরও এখন আমরা যাকে পাট বলি, প্রাচীনকালের লোকেরা পাট বলতে শুধু একেই বোঝাত কিনা সন্দেহ। শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসুর মতে, প্রাচীনকালের হিন্দুরা শণ জানতেন এবং শণী, পাট ভঙ্গি (এক প্রকার মোটা কাপড়ের নাম) প্রভৃতি শব্দ একই অর্থে ব্যবহার করতেন। অর্থাৎ তারা পাট ও শণের প্রভেদ বিশেষ জানতেন না। ঊনবিংশ শতাব্দীর আরম্ভ হতেই পাট শব্দ তার বর্তমান অর্থে ব্যবহৃত হতে শুরু হয়েছে।[৫] সুতরাং প্রাচীন বাংলা তথা ভারতে পাটের চাষ এখনকার মতো বিস্তৃত না হলেও ছিল যে সন্দেহ নেই। শুধু তাই নয়, নীহাররঞ্জন রায়ের মতে, প্রাচীন বাংলার সর্বাপেক্ষা প্রশস্ত শিল্প ছিল বস্ত্রশিল্প এবং নানা উপলক্ষে, বিশেষ করে পূজা, ব্রত, বিবাহানুষ্ঠান ইত্যাদি ব্যাপারে পট্টবস্ত্র ব্যবহারেরও খুব প্রচলন ছিল।[৬] তবে নীহাররঞ্জন প্রাচীন বাংলার সর্বাপেক্ষা প্রশস্ত শিল্প হিসেবে যে বস্ত্রশিল্পের উল্লেখ করেছেন তা পাট দিয়ে তৈরী শাড়ি প্রভৃতি বস্ত্রাদি নয়। কারণ প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলায় বস্ত্রশিল্প অনুন্নত স্তরের ছিল। অর্থাৎ পাট (Jute) বলতে আমরা যে গাছপাট বুঝি তা দিয়ে শাড়ি প্রভৃতি উন্নত বস্ত্রাদি প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলায় প্রস্তুত হতো, তা কল্পনা করা বৃথা। সুতরাং প্রচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে ব্যবহৃত পট্টবস্ত্র (পাট বা পাটোল) হচ্ছে 'কৌষেয় বস্ত্র' অর্থাৎ 'রেশমি কাপড়'।

প্রাচীন ও মধ্যযুগের বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থে পট্টবস্ত্র বা পাট বা পাটোল শব্দের ভিন্নার্থক ব্যবহারের বিভিন্ন দৃষ্টান্ত নিম্নে দেওয়া হলো :

মনুসংহিতায় পট্টবস্ত্রের উল্লেখ সম্পর্কে কাজী মোহাম্মদ মিছের বলেন,

> ভারতের প্রাচীন বাসিন্দা মনুষ্য জাতি পৌরাণিক মতবাদে বিশ্বাসী বেদ-পুরাণের অনুসারী হিন্দুর আচার অনুষ্ঠানে, যাগ-যজ্ঞাদিতে দেশী উৎপন্ন দ্রব্যাদি ভিন্ন বিদেশী দ্রব্যাদি ব্যবহারের রীতি নেই। দেশজ দ্রব্যাদি জিনিষপত্র ব্যবহার করিতে তাহারা গৌরব বোধ করিত। ... হিন্দুর ধর্মীয় ক্রিয়াদিতে পট্টবস্ত্রের ব্যবহার প্রচলিত দেখে সম্ভবতঃই মনে হয় এ দেশের প্রাচীন

হিন্দুরা বিদেশী দ্রব্যাদি ব্যবহার করিত না। কেহ কেহ বৈদিক গ্রন্থে 'ক্ষৌম বসনে বসনা' ইত্যাদি প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া বিবাহে ব্যবহৃত উক্ত ক্ষৌম বস্ত্রকেই রেশম বলিয়াছেন। পরবর্তী স্মৃতি-সাহিত্যে যেখানে ক্ষৌম বস্ত্রের উল্লেখ আছে, সেখানে প্রাচীন টীকাকারেরা ক্ষৌম শব্দের অর্থ শণ নির্মিত বস্ত্র ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অথর্ব্ব বেদীয় কৌশিক সূত্রে 'ক্ষৌমকীং বৈশ্যায়' অর্থাৎ বৈশ্যাকে ক্ষৌম নির্মিত মেখলা দিবে। এই ক্ষৌম শব্দ দেখে কেউ কেউ রেশম কল্পনা করেন। কিন্তু মনুসংহিতাকার স্বয়ং ঐ ক্ষৌম শব্দের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন, 'ক্ষত্রিয়স্য তু মৌর্ব্বীজ্যা বৈশ্যাস্য শণতান্তবী' অর্থাৎ বৈশ্যের শণতন্ত্র মেখলা হবে। ক্ষৌম শব্দে পট্টবস্ত্র বুঝায়, তবে এই পট্টবস্ত্রের অর্থ শণের পাট; রেশম নহে।[৭]

৫ম খ্রিষ্টপূর্বাব্দে অমরসিংহ রচিত *অমরকোষ* গ্রন্থে পট্টবস্ত্র সম্পর্কে বলা হয়েছে :

স্যাজ্ জটাংশুকয়োঃ নেত্রম্।[৮]
(পাট - নেত -স° = পট্টনেত্র > নেত্রম= পট্টবস্ত্র)

প্রাচীনকালের *মনুসংহিতায়* পট্টবস্ত্র সম্পর্কে বলা হয়েছে :

শ্রীফলৈরংশু পট্টানাং ক্ষৌমানাং গৌরসর্ষপৈঃ।[৯] (শ্লোক ৫। ১২০)

অর্থ : আংশু পট্ট শ্রীফল দ্বারা এবং গৌর সর্ষপ দ্বারা ক্ষৌম বস্ত্র শোধন করতে হবে।

ত্রয়োদশ শতকের কবি রামাই পণ্ডিত রচিত *শূন্যপুরাণ* কাব্যে পট্টবস্ত্রের ব্যবহারের বর্ণনা পওয়া যায়। *শূন্যপুরাণে* বলা হয়েছে :

সুনার কলসি নিল নেতর বসন।[১০]

চতুর্দশ শতকের বড়ু চণ্ডীদাস রচিত *শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন* কাব্যে পট্টবস্ত্রের ব্যবহারের যে বর্ণনা পওয়া যায় তা নিম্নে দেওয়া হলো ।

১. *শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন* কাব্যের তাম্বুলখণ্ডে বলা হয়েছে :

কহির কপুর তাম্বুল বড়ায়ি
কহির নেত পাটোল।
নেআলী মাহলী আওর নানা ফুল
কে দিআঁ পাঠাইলে মোর ॥[১১]
(পাহাড়ী আরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥ লগনী প্রকীর্ণক)

২. পট্টবস্ত্র পরিধানে রাধার সৌন্দর্য বৃদ্ধি সম্পর্কে *শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন* কাব্যের দানখণ্ডে বলা হয়েছে :

আতি বিতপনী রাধা পরিধান পাট।
আলকে তিলক তোর শোভএ ললাট ॥[১২]
(পাহাড়ী আরাগঃ ॥ রূপকং)

৩. পাটোল সম্পর্কে *শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন* কাব্যের দানখণ্ডে বলা হয়েছে :

পরিধান তোর সুরঙ্গ পাটোল
ধিরে যাসি বাটে।

আর আদভূত দেখোঁ চন্দ্রাবলী
সিন্দূর সুর ললাটে ॥[১৩]
(পাহাড়ী আরাগঃ ॥ রূপকং)

৪. পাটোল সম্পর্কে *শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন* কাব্যের দানখণ্ডে আরো বলা হয়েছে :

নেত পাটোল না পিন্ধিবোঁ
না পিন্ধিবোঁ সিসত সিন্দূর।[১৪]
(কোড়ারাগঃ ॥ যতিঃ)

৫. পাটের শাড়ি সম্পর্কে *শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন* কাব্যের দানখণ্ডে আরো বলা হয়েছে :

পিন্ধিলোঁ পাটের সাড়ী।
খোম্পাত উপর গুজরে ভ্রমর
তাহাত কাহ্নের ধাড়ী ॥[১৫]
(ভাঠিআলীরাগঃ ॥ ক্রীড়া)

৬. পাটোল সম্পর্কে *শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন* কাব্যের দানখণ্ডে বলা হয়েছে :

শম্ভু সম বান্ধি খোপা পাটোল পহিআঁ।
বিকে যাসি গোআলিনী লাস করিআঁ ॥[১৬]
(রামগিরীরাগঃ ॥ রূপকং)

৭. পাটোল সম্পর্কে *শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন* কাব্যের দানখণ্ডে আরো বলা হয়েছে :

আর না পিন্ধিবোঁ বড়ায়ি সুরঙ্গ পাটোল।
এহা দেখি মাঁগে কাহ্নাঞিঁ বিরহের কোল ॥[১৭]
(ভাঠিআলীরাগঃ ॥ রূপকং)

৮. পাট-নৌকা সম্পর্কে *শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন* কাব্যের নৌকাখণ্ডে বলা হয়েছে :

পাঞ্চ গুটী পাট নাঅ গঢ়ন আক্ষার।
একেঁ একেঁ সব সখি করি তোর পার ॥[১৮]
(পাহাড়ীআরাগঃ ॥ প্রকীর্ণক লগন ॥ লঘুশেখরঃ)

৯. পাট-নৌকা সম্পর্কে *শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন* কাব্যের নৌকাখণ্ডে আরো বলা হয়েছে :

পাঞ্চ পাটের নাঅ মন্থায়িল বাএ।
নিষধিতেঁ আল রাধা চঢ়িলা নাএ ॥[১৯]
(রামগিরীরাগঃ ॥ আঠতালা)

১০. পাট-নৌকা সম্পর্কে *শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন* কাব্যের নৌকাখণ্ডে আরো বলা হয়েছে :

পাঞ্চ পাটের নাঅ গাতর ভরা।
হৃদের কাঞ্চুলী রাধা যমুনাত পেলা ॥[২০]
(গুজ্জরীরাগঃ ॥ যতিঃ)

১১. ১৬ হাত দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট পট্টবস্ত্র সম্পর্কে *শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন* কাব্যের যমুনাখণ্ডে বলা হয়েছে :

হের ষোল হাথ মোর পাটোল।
এহা নেহ মোর ধরহ বোল ॥
সুদ্ধ সুবন্নের মোহোর বাঁশী।
এহা নেহ রাধা পাসত বসী ॥
তোর বাঁশী মোএঁ ঘসি না ঘাটোঁ।
তাক হাথে করী দুধ না আউটোঁ ॥
তোর পাটোলের সুণ কথা।
সে মোহোর ঘৃতভাণ্ডের নাথা ॥[২১]
(কোড়ারাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥ লগনী ॥ দণ্ডকঃ)

১২. পাটোল সম্পর্কে *শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন* কাব্যের হারখণ্ডে বলা হয়েছে :

যে বেলাএ পাটোল মোর নিলে গদাধরে।
তথিত উপর ছিল সাতেশরী হারে ॥
আনেক যতনে মোরে দিলে পাটোলে।
হরিলেক হার মোর বালগোপালে ॥[২২]
(মল্লাররাগঃ ॥ রূপকং)

১৩. পট্টবস্ত্র সম্পর্কে *শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন* কাব্যের বাণখণ্ডে বলা হয়েছে :

পাট পরিধান তোর নেতের আঁচল ল
মাণিকেঁ খঞ্চিল দুঈ পাশে।
বারেক জিঅ রাধা রতি ভুঞ্জ মুখে ল।[২৩]
(আহেররাগঃ ॥ একতালী)

১৪. পাট ক্ষেত বা পাটের জমি সম্পর্কে *শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন* কাব্যের বংশীখণ্ডে বলা হয়েছে :

এবেঁ কে না নীল মোহন বাঁশে।
মুকুতার ঝারা পাটথোপ দুইপাশে ॥[২৪]
(কোড়ারাগঃ ॥ যতিঃ)

চৌদ্দ-পনেরো শতকের কবি বিদ্যাপতি বিরচিত কাব্যের বিবরণ থেকেও আমরা পাট শব্দের ব্যবহার সম্পর্কে জানতে পারি।

১. পট্টবস্ত্র সম্পর্কে বিদ্যাপতির পদে বলা হয়েছে :

মাঝখীণ তনু, ভরে ভাঁগি জায়ে জনু,
বিধি অনুশয়ে ভেল সাজি।
নীল পাটোর আনি, অতি সে সুদৃঢ় জানি,
যতনে সৃজিল রোমরাজি ॥[২৫]

২. পট্টবস্ত্র সম্পর্কে বিদ্যাপতি-রচিত পদে আরো বলা হয়েছে :

হস্তিনী চিত্রিনী পদুমিনী নারী।
গোরী শামরী এক বুড়ী বারি ॥
বিবিধ ভাঁতি করলহি শিঙ্গার।
পরিধান পাটোর গীম ঝুল হার ॥[২৬]
(বসন্তবিরহ - ৪)

৩. পট্টবস্ত্রের উৎপাদন সম্পর্কে বিদ্যাপতির পদে বলা হয়েছে :

পটসূতি বুনি বুনি মোতি সরি কিনি কিনি
মোরে পিয়াঞেঁ গাথল হার।
লখে লেখি তহ্নি হম হার গাথল
সে আবে তোড়ত গমার ॥[২৭]
(বিরহ - ৬২)

আঠারো শতকের কবি ভারতচন্দ্র রচিত *অন্নদামঙ্গল* কাব্যের হর-গৌরীরূপ অংশে বলা হয়েছে :

আধ বাঘছাল ভাল বিরাজে
আধ পটাম্বর সুন্দর সাজে।[২৮]

সুতরাং প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন কবিতা-পঙ্‌ক্তিমালায় পট্টবস্ত্র বা পাট বা পাটোল শব্দটির বহুল ব্যবহার থেকে অনুমান করা যায় যে, সাধারণ মানুষের নিকট শব্দটি বেশ জনপ্রিয় ছিল। অবশ্য পাট বলতে বর্তমানে যা বোঝায় মধ্যযুগের সাহিত্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা যে বোঝানো হয়নি, সেটা স্পষ্ট। বরং ভিন্নার্থে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। অবশ্য মতিলাল মজুমদারের মতে, চতুর্দশ শতকের চণ্ডীদাসের পরবর্তী সময়ে অর্থাৎ ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকের বাংলা সাহিত্যে পাট থেকে প্রস্তুত 'পট্টবস্ত্র', 'পাটের থলে' প্রভৃতির উল্লেখ পাওয়া যায়।[২৯] কামরুন্নেসা ইসলাম বলেন, মধ্যযুগের শেষ দিকে রচিত বাংলা সাহিত্যেও পাটজাত দ্রব্য, বিশেষ করে 'পাট-সাদী'সহ বিভিন্ন প্রকার বস্ত্র উৎপাদনের নিদর্শন পাওয়া যায়।[৩০]

যা হোক, প্রাচীনকাল থেকে ভারতে পাটের চাষ হয়ে আসছে। এক সময়ে এটি বাগানের উদ্ভিদ হিসেবে বিবেচিত হতো। তখন এর ব্যবহার ছিল সীমিত; কেবল পাতা সব্‌জি ও চিকিৎসার কাজে ব্যবহৃত হত।[৩১] নীহাররঞ্জনের মতে, প্রাচীনকালে পাটের কচিপাতা বা নালিতা শাক এখনকার মতো তখনও বাঙালির প্রিয় খাদ্য ছিল।[৩২]

প্রাচীনকালের *রাজবল্লভ* গ্রন্থে সবজি হিসাবে পাটশাকের অর্থাৎ পাটের ব্যবহারের বর্ণনা পাওয়া যায়। এ গ্রন্থে সবজি হিসাবে পাটশাকের ব্যবহার ও তার গুণাগুণের (এর গুণ মধুর, দুর্জর ও গুরুপাক) কথা উল্লেখ করা হয়েছে। *রাজবল্লভ* গ্রন্থে বলা হয়েছে :

পাট্যশাকান্তু মধুরং দুর্জরং গুরুপাকি চ।[৩৩]

প্রচীনকালের ন্যায় মধ্যযুগেও বাংলার পাটচাষ সম্পর্কে সুস্পষ্ট এবং বিস্তারিত প্রমাণ পাওয়া যায়। চতুর্দশ শতাব্দের চণ্ডীদাস (বড়ু চণ্ডীদাস) রচিত *শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন* কাব্যের ভারখণ্ডে পাটের ব্যবহার সম্পর্কে সবিস্তার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। এ কাব্যে পাটচাষ, পাট পচন প্রক্রিয়া, পাটের দড়ি ও পাটের শিকা অর্থাৎ গৃহকর্মে পাটের ব্যবহার সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়। *শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন* কাব্যে পাটের এ ধরনের ব্যবহার দেখে অনুমান করা যায় যে, মধ্যযুগে কৃষিপণ্য হিসাবে পাট মানুষের আর্থ-সামাজিক জীবনে প্রভাব বিস্তার করেছিল। পাটচাষ, পাটের দড়ি ও পাটের তৈরী শিকা সম্পর্কে *শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন* কাব্যের ভারখণ্ডে বলা হয়েছে :

নালিচা কাটিআঁ কাহ্নাঞি মাঝজলে থুইল।
বার পহর হয়িলেঁ তাহাক তুলিল ॥
সুখায়িআঁ বাছিআঁ পাট করিল সুসর।
চারী গুণ দড়ী পাকাইল দামোদর ॥
সুদৃঢ় বন্ধনে কৈল দুয়ি শিকিআ।
তলত গাঁথিল তার দুগুটি বেণ্ডুআ ॥
বাঁহুক যোড়িআঁ গেলা যমুনার পারে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীবরে ॥[৩৪]
(কোড়ারাগঃ ॥ ক্রীড়া)

ষোড়শ শতকের কবি শ্রীরায়বিনোদের *পদ্মাপুরাণ* কাব্যে পাট সম্পর্কে একটা বিবরণ পাওয়া যায়। *পদ্মাপুরাণ* কাব্যের এ বিবরণ থেকে আমরা সে সময়ে পাটের ব্যবহার সম্পর্কে জানতে পারি।

১. *পদ্মাপুরাণ* কাব্যে পাট সম্পর্কে বলা হয়েছে :

কোষ্টাপাট হাতে লৈয়া চান্দো জাএ আগু হৈয়া
শুন শুন নৃপতিশেখর।।
পাট বদলে লৈবা শ্বেত চামর দিবা
তবে মিতা করিব বদল।
পাট রাজারে দিয়া শ্বেত চামর দিয়া
তোলে নিয়অ ডিঙ্গার উপর।।[৩৫]

২. *পদ্মাপুরাণ* কাব্যে পাটের শাক (নালিতাপত্র) সম্পর্কে বলা হয়েছে :

লইয়া নালিতাপত্র চান্দো আগুসারে।
নালিতাপত্রের গুণ কহে সদাগরে।।
নালিতাপত্র খাইলে হএ সুন্দর কলেবর।
কফ পিত্ত নষ্ট হএ শরীর নির্মল।।
নালিতার পত্র তবে যদি মিতা লৈবা।

নালিতা বদলে মিতা মুক্তা মোরে দিবা।।
সমান বদলে চান্দো করি অনুমান।
সুক্তা দিয়া মুক্তা লৈল করিয়া সমান।।[৩৬]

সপ্তদশ শতকে মানিকরাম রচিত *ধর্মমঙ্গল* কাব্যে তৎকালীন বাংলার অর্থনৈতিক চিত্র পাওয়া যায়। পাটের ক্ষতির সঙ্গে মানুষের আর্থিক ক্ষতির দিকটির প্রতি এ কাব্যে ইঙ্গিত করা হয়েছে। *ধর্ম্মমঙ্গল* কাব্যে বলা হয়েছে :

পাট পাট ভেসে গেল পোদ্দারের কড়ি।[৩৭]

এখানে অন্য অর্থে হলেও পাট শব্দটির ব্যবহার লক্ষণীয়। সুতরাং মধ্যযুগের বাংলা-সাহিত্যের পাট-সম্পর্কিত কবিতা পঙ্‌ক্তিমালা প্রমাণ করে, সে সময়ে পাট জনপ্রিয় ছিল।

প্রাচীন ও মধ্যযুগের ন্যায় আধুনিক বাংলার কবি-সাহিত্যিকেরাও পাট সম্পর্কে অসংখ্য কবিতা-পঙ্‌ক্তিমালা, প্রবাদ-প্রবচন প্রভৃতি রচনা করেছেন। এসব কবিতা-পঙ্‌ক্তিমালা, প্রবাদ-প্রবচনে লেখকেরা পাটচাষ, পাটচাষের খরচ, অভাবের কারণে মৌসুমের আগেই পাট সংগ্রহ ও বিক্রি করা, পাট বিক্রির মাধ্যমে কৃষকের ঋণ শোধ, পাট ব্যবসায়ের সঙ্গে জড়িত ফড়িয়া ও দালাল শ্রেণি, বাংলায় ইউরোপীয়দের আগমনের মাধ্যমে কৃষকশ্রেণির আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন, ইউরোপীয়দের পাটের ব্যবসায়ে অংশ গ্রহণ, পাটের সঙ্গে নারীর সম্পর্ক ইত্যাদি অর্থাৎ এর মাধ্যমে বাংলার কৃষকশ্রেণির আর্থ-সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যে পাট নিয়ে রচিত বিভিন্ন কবিতা-পঙ্‌ক্তিমালা, প্রবাদ-প্রবচন, ছড়া প্রভৃতির বিবরণ নিম্নে উপস্থাপন করা হলো :

১. কবি আবদুল সামাদ মিয়া তাঁর লোক কবিতায় ইউরোপীয়দের আগমনের ফলে কৃষক শ্রেণির আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন সম্পর্কে বলেন :

পাট আসিয়া যখন দেশেতে পৌঁছিল
পশ্চিমা এসে তখন দখল করিল
এখন তাদের হাতে দেখ পয়সা হইল
বাঙ্গালীরে তারা দেখ কিছু না বুঝিল
না পাইত খাইতে যারা ছাতুয়ার গুড়াঁ
বালামের ভাত খায়া বুজে দেখ তারা
না মিলে বাঙ্গালীর রেঙ্গুনের ভাত
বোবা হয়ে গেল দেখ বাঙ্গালীর জাত।[৩৮]

২. আবেদ আলী মিয়া তাঁর লোক কবিতায় পাটচাষের খরচ ও কৃষকের ঋণ সম্পর্কে বলেন :

বুঝলি না তুই বুড়ার বেটা, আবেদের কথা নয়কো ঝুটা
খেতে হবে পাটের গোড়া ছিক জানিস মো ভাষা
মনে করোছো নিব টাকা

সে আশা দোর যাবে ফাঁকা
পঁচিশের পয়া হবে তোর; ঋণে পড়বি ঠাসা
নিবি বটে টাকা ঘরে
পেটের দায়ে যাবে ফুরে
হিসেব করে দিখিস খাত, যতো খরচের পাশা।[৩৯]

৩. অভাবের কারণে মৌসুমের আগেই পাট সংগ্রহ সম্পর্কে একটি প্রবাদে বলা হয়েছে :

পাট কাটিতে তর সহে না।[৪০] (১২৬৩ সংখ্যক)

৪. পাটের সঙ্গে নারীর সম্পর্ক বিষয়ে একটি প্রবাদে বলা হয়েছে :

উঠলে ঢেঁকি, বসলে পাট, সাত পাথর আমানি যত পায় ভাত।[৪১] (৫৯৪ সংখ্যক)

৫. ইউরোপীয়দের পাটের ব্যবসায়ে অংশগ্রহণ সম্পর্কে একটি প্রবাদে বলা হয়েছে :

একচির পান দু'চির হ'ল, সোনার পাটে ভাগ বসাল।[৪২] (৬৮৬ সংখ্যক)

৬. ষড়ঋতুর সঙ্গে পাটের সম্পর্ক বিষয়ে একটি প্রবাদে বলা হয়েছে :

ছোট মাগ পাটরাণী, বড় মাগ ধান ভানানী।[৪৩] (২৪১৭ সংখ্যক)

৭. পাট ব্যবসায়ের সঙ্গে জড়িত ফড়িয়া ও দালাল শ্রেণি সম্পর্কে একটি জনপ্রিয় ছড়ায় বলা হয়েছে :

ধানের দালাল, পাটের কয়াল,
কড়া বাঁশের ধারী, পায়ে লাড়িচাড়ি।[৪৪]
(মিশ্র, ২৯৩ সংখ্যক)

উপর্যুক্ত পর্যালোচনা শেষে আমরা বলতে পারি যে, প্রাচীন, মধ্য এবং আধুনিক বাংলা সাহিত্যে রচিত পাট-সম্পর্কিত বিভিন্ন কবিতা-পংক্তিমালা থেকে সমসাময়িক সময়ের সাধারণ মানুষ বিশেষত বাংলার কৃষক শ্রেণির আর্থ-সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে একটা সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়।

তথ্যনির্দেশ

১. *Marketing of Jute in East Pakistan,* Prepared by A Research Team of the Dacca University Socio- Economic Research Board, (Dacca : The Dacca University Socio- Economic Research Board, 1961), P. 1.
২. *Bundle No. 1, File No. 7, No. 25, Progs. For July 1873, 'A' Proceedings* : Proceedings of the Department of Agriculture, Government of Bengal, Bengal Secretariat Records.
৩. *Bundle No. 1, File No. VII, No. 16, Progs. For April 1873, 'A' Proceedings* : Proceedings of the Department of Agriculture, Government of Bengal, Bengal Secretariat Records, P. 2.

৪. সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪-১৯৭১*, অর্থনৈতিক ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড (ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ১৯৯৩), পৃ. ৩২৬

৫. শ্রী নগেন্দ্রনাথ বসু (সম্পাদিত), *বিশ্বকোষ*, একাদশ ভাগ, (কলিকাতা : ইউ সি বসু এন্ড কোম্পানী, ১৩০৭), পৃ. ১২৫

৬. নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙ্গালীর ইতিহাস*, আদিপর্ব, (কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ১৪০০), পৃ. ১৫০

৭. কাজী মোহাম্মদ মিছের, *রাজশাহীর ইতিহাস*, ১ম খণ্ড (ঢাকা : সৈয়দা হোসেনে আরা বেগম, ১৯৬৫), পৃ. ৩৭-৩৮

৮. শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, *কবিকঙ্কণ-চণ্ডী : চণ্ডীমঙ্গল-বোধিনী*, প্রথমভাগ, (কলিকাতা : কলিকাতা ইউনিভারসিটী প্রেস, ১৯২৫), পৃ. ২৭১

৯. কাজী মোহাম্মদ মিছের, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৮

১০. শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৭১

১১. বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ (সম্পাদিত), *শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন*, চণ্ডীদাস বিরচিত, (কলিকাতা : বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, পুনর্মুদ্রণ, ২০০০), পৃ. ৮

১২. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭

১৩. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪

১৪. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪

১৫. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩২

১৬. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৫

১৭. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৫

১৮. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৮

১৯. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬২

২০. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৩

২১. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৫

২২. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৩

২৩. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৩

২৪. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৩

২৫. উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত), *বৈষ্ণব পদাবলী*, কবি বিদ্যাপতি বিরচিত, (কলিকাতা : বসুমতি সাহিত্য পরিষদ), পৃ. ৩৬

২৬. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৭

২৭. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮৬

২৮. শ্রীনির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায় (সম্পাদিত), *অন্নদামঙ্গল*, ভারতচন্দ্র বিরচিত, (কলিকাতা : মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিঃ,পুনর্মুদ্রণ , ১৯৯৭), পৃ. ৭০

২৯. মতিলাল মজুমদার, *পূর্ব ভারতের ফসল* (কলিকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৯১), পৃ. ২৭৭

৩০. Kamrunnesa Islam, *Aspects of Economic History of Bengal, C. 400 - 1200 A.D.*, (Dhaka : Asiatic Society of Bangladesh, 1984), P. 39.

৩১. সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), *বাংলা পিডিয়া : বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞানকোষ*, ৫ম খণ্ড, (ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৩), পৃ. ৩২৬

৩২. নীহাররঞ্জন রায়, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৫০
৩৩. শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু, *বিশ্বকোষ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪০
৩৪. বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ (সম্পাদিত), *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৬৬
৩৫. মুহাম্মদ শাহজাহান মিয়া (সম্পাদিত), *পদ্মাপুরাণ*, পৃ. ২১৭
৩৬. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১৮
৩৭. শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪৩৪
৩৮. সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪-১৯৭১*, দ্বিতীয় খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৩
৩৯. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৯
৪০. রেভারেণ্ড জেমস লঙ, *প্রবাদমালা*, প্রথম খণ্ড (কলিকাতা : নবপত্র প্রকাশন, ১৯৮০), পৃ. ৫৭
৪১. শ্রী সুশীলকুমার দে (সম্পাদিত), *বাংলা প্রবাদ : ছড়া ও চলতি কথা*, (কলিকাতা : রঞ্জন পাবলিশিং হাউস, ১৩৫২), পৃ. ৩৯
৪২. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৫
৪৩. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫২
৪৪. ওয়াকিল আহমদ, *বাংলা লোকসাহিত্য : প্রবাদ ও প্রবচন*, (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪), পৃ. ১০১